তারিখ 01 FEB 2016
পৃষ্ঠা 26 কলাম 2

কালের কণ্ঠ

মো. আবুসালেহ সেকেন্দার ▷

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফি, শিক্ষা ও গবেষণা

বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯১টি। ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। রাজনীতি ও সেশনজট মুক্ত হওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ না পাওয়া শিক্ষার্থীরা বিদেশে পাড়ি না জমিয়ে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। অনেক ক্ষেত্রে পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পছন্দের বিষয় না পাওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীই পছন্দের বিষয়ে পড়তে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছেন। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও মেধাবীরা রয়েছেন। তবে উচ্চ বেতন, সেশন চার্জ ও নানা অজুহাতে বিভিন্ন খাতে ফি আদায়ের কারণে অনেক সময় মেধাবী শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারছেন না। যদিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুসারে এমনটি হওয়ার কথা নয়। ওই আইনে 'শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার মানদণ্ডে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষার্থী ফি কাঠামো প্রস্তুত' করার কথা। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ওই ধারা মানছে না।

অবশ্যই সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে বিদ্যমান আইনের সংশোধন করে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নির্ধারণ করে দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। তবে টিউশন ফির লাগাম টেনে ধরতে আইন সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বিদ্যমান আইনেই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বিদ্যমান আইনে শিক্ষার্থীদের ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইউজিসির অনুমোদন নিতে হয়। তাই 'গলাকাটা ফি' ইউজিসির জ্ঞাতসারে আদায় করা হচ্ছে তা বলা ভুল হবে না। এখন ইউজিসি যদি অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'শিক্ষার্থী ফি' অনুমোদন না দেয় অথবা অনুমোদনের আগে আইনে উল্লিখিত শর্ত অর্থাৎ 'আর্থসামাজিক অবস্থা' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার মান অনুসারে' ফি নির্ধারণ করতে বাধ্য করে, তবে নতুন করে আর আইন সংশোধন বা প্রণয়ন করার দরকার হবে না।

২.

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদমতে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ফি সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন। সরকারের এমন উদ্যোগে তাঁদের বিস্মিত অথবা ক্ষুব্ধ হওয়ায় কিছু নেই। আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অনেক উৎসের কথা বলা হয়েছে। 'শিক্ষার্থীদের ফি' ওই উৎসগুলোর মধ্যে একটি গৌণ উৎস। যদিও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'লাভজনক' প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর ওই লাভের অঙ্ক বাড়ানোর আশায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই বর্ধিত ফি আদায় করে। তবে আইন অনুসারে জনকল্যাণকামী ব্যক্তি, ব্যক্তিগোষ্ঠী, দাতব্য ট্রাস্ট বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিঃশর্তভাবে প্রদত্ত দান, অনুদান অথবা শর্তসাপেক্ষ প্রাপ্ত ঋণ, বিভিন্ন খাতে সৃষ্ট সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় এবং সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের পর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব না হয় তখন যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু অর্থই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি হিসেবে আদায় করার সুযোগ রয়েছে। যাদের উপরোক্ত আয়ের উৎস নেই তাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশের প্রায় সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ই আইনের ওই বিধান উপেক্ষা করে অলাভজনক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। তাই সরকারের উচিত হবে নতুন আইন তৈরির নামে দীর্ঘসূত্রতায় না গিয়ে বিদ্যমান আইনেই শিক্ষার্থীদের ফি আদায়ের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাগাম টেনে ধরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ার আগে শিক্ষার্থী ফি আদায় ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অন্য উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে কি না সে বিষয়টি নিশ্চিত করা। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যখন শিক্ষার্থীদের ফি আদায়ের জন্য ইউজিসির অনুমোদন প্রার্থনা করে তখন যাচাই-বাছাই করে শুধু প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি হিসেবে আদায় করার অনুমোদন প্রদান করলে নতুন আইন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধ করা যাবে।

৩.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলে সরকার নিযুক্ত প্রতিনিধি থাকলেও বিদ্যমান আইন অনুসারে ট্রাস্টি বোর্ডে সরকারের প্রতিনিধি নেই। আইন সংশোধন করে ট্রাস্টি বোর্ডেও সরকারের প্রতিনিধি থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা ভাবা হচ্ছে। ট্রাস্টি বোর্ডের নামে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের অনেক সদস্যের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল হরিলুটের অভিযোগ রয়েছে। তাই পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের রাহুগ্রাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রক্ষা করার জন্য এমন উদ্যোগ সমর্থন করা যেতে পারে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আমলাদের নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে যাওয়ার যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে সে বিষয়টিও আমলে নিতে হবে। একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের মতো ট্রাস্টি বোর্ডেও শিক্ষাবিদরা যাতে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। অবশ্যই বর্তমানে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি থাকার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাবিদের নামে আমলা, ব্যবসায়ী অথবা রাজনীতিবিদরা ওই পদে নিযুক্তি লাভ করছেন। এ ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপকদের ওপর ওই দায়িত্বগুলো অর্পণ করলে বিদ্যমান অনেক সংকটের সমাধান হবে। পাশাপাশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকদের অংশগ্রহণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বাড়বে।

৪.

জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান সৃষ্টি ও জ্ঞান বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। কিন্তু দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়টি একেবারেই অনুপস্থিত। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই শুধু সনদ বিক্রি করছে। 'উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা'—জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর এ বক্তব্য আজও কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করতে পেরেছে কি না সে বিষয়টি প্রশ্নসাপেক্ষ। ফলে প্রতিবেশী ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশে পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে টপকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বময় পরিচিত হয়ে উঠলেও এ দেশে পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায় না।

এ ছাড়া আইন অনুসারে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের নিমিত্ত পর্যাপ্তসংখ্যক শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, মিলনায়তন, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষার্থীদের পৃথক কমন রুম ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কক্ষের জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও অবকাঠামো থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় এ শর্তগুলোও পূরণ করেনি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখে মনে হয় তারা যেন দোকান খুলে বসেছে। একটি ফ্লোরে শপিং মল, গার্মেন্টের পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে গেছে।

এ কথা ঠিক, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় দেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের বিষয়টিও সরকারকে ভাবতে হবে। তাই সরকারের উচিত হবে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করার স্বার্থে দ্রুত অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম শুরু করা। পাশাপাশি সব বিশ্ববিদ্যালয়কে আইনের সব শর্ত পূরণে বাধ্য করা। অবশ্যই প্রয়োজনে আইন সংশোধন দোষের নয়। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলে শিক্ষা ও গবেষণার মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য নতুন আইনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব। সরকার আইন প্রণয়নের নামে কালক্ষেপণ না করে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান নিশ্চিত করবে—এমনটিই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়